মে দিবস
সংখ্যা ২০২৪

সম্পাদকীয়

বর্ষপরিক্রমায় আবারও এসেছে মে দিবস। মে দিবস বহু বছর থেকেই ছুটির দিন। ছুটির দিন হলেই একটা কর্মহীন দিন, রাস্তাঘাটে যানজট কম। অল্পসংখ্যক কিছু মিছিল, ট্রাকে করে কিছু শ্রমিকের যাতায়াত এবং কিছু স্লোগান শুনতে পাওয়া যায়। জেলা শহরগুলোতে পরিবহনশ্রমিকদের মধ্যাহ্নভোজ, সঙ্গে নেতা ও মালিকদের ছোট ছোট সভা—এসবের মধ্যেই পালিত হয় মে দিবস। এখন নেই আগের মতো মে দিবস পালনের প্রবণতা। কিন্তু একদা এই শহরে মে দিবস পালিত হতো বেশ জমজমাট মিছিল, সভা এসবের মধ্য দিয়ে। এখন তা নিষ্প্রভ হয়ে উঠেছে। তবে একসময় শিল্প-সাহিত্যে মে দিবস একটা জায়গা দখল করে নিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যেও এর প্রভাব পড়েছিল। মে দিবস ও শ্রমিকশ্রেণির রাজনীতি নিয়ে বহু কালজয়ী নাটকের জন্ম হয়েছিল। মে দিবস পালনের একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে এই দিনের ইতিহাস তুলে ধরা, শ্রমজীবী মানুষের ওপর নিপীড়নের একটা শৈল্পিক অভিব্যক্তির প্রকাশ এবং সবচেয়ে মুখ্য বিষয় হচ্ছে কর্মসংস্কৃতিতে মানুষকে উজ্জীবিত করে তোলা। পশ্চিমা দুনিয়ায় শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হলেও উপমহাদেশে এখনো তা সুদূরের স্বপ্ন থেকে গেছে। শ্রমজীবী মানুষকে এখনো আমরা সম্মানের আসনে বসাতে পারিনি। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে মেহনতি মানুষের রাজনীতি হলেও শ্রমজীবী মানুষের সংস্কৃতিটা গড়ে ওঠেনি। ১৮৮৬ সালের রক্তঝরা সেই ১ মে এখন সবার কাছে অবিচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জোর সংগ্রামের শপথ গ্রহণের দিন। সামনে এগিয়ে যাওয়ার মূলমন্ত্র। মে দিবসে সকল শ্রমজীবি মানুষ তাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করার মাধ্যমে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করুক। জয় হোক সাম্যের, জয় হোক মেহনতি মানুষের।

মহান মে দিবসে আমাদের সম্মানিত পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও সমগ্র দেশবাসীর জন্য রইলো অগণিত শুভ কামনা।

সম্পাদক: তৌহিদুল ইসলাম মিন্টু
৪, বিজয় নগর, জেবুন ইনডেক্স ট্রেড সেন্টার, লিফট-১৩,ঢাকা -১০০০
মোবাইল: ০১৭১৬৬০৬৭৯৯,
নিউজ রুম ইমেইল : thereport24@gmail.com

কেন এতো মহান মে দিবস

মাহি হাসান

বিশ্বজুড়ে আজ উদযাপিত হচ্ছে মহান মে দিবস। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন হিসেবে পালন করা হয় এই দিবসটিকে। মূলত প্রতি বছর ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসাবেও চিহ্নিত এই দিনটির ইতিহাস সম্পর্কে অনেকেরই জানা নেই। দেখে নেওয়া যাক, কেন পালন করা হয় এই দিবসটি। আর এই এই দিবসের তাৎপর্যই বা কী?

১৮৮৬ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে ন্যায্য মজুরি এবং দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর পুলিশ গুলি চালালে অনেক শ্রমিক হতাহত হন। আর এরপর থেকেই এই দিনটি পালিত হয়ে আসছে মে দিবস বা শ্রমিক দিবস হিসেবে। মূলত সেই ঘটনার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালন করা হয়। যদিও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে এই দিবসটি পালন করা হচ্ছে ১৯২৩ সাল থেকে।

১৮৮৬ সালে শিকাগো শহরের হে মার্কেটে দৈনিক ৮ ঘণ্টার কাজের দাবিতে শ্রমিকরা জমায়েত হয়েছিলেন। তাদের ঘিরে থাকা পুলিশের প্রতি কেউ একজন বোমা নিক্ষেপ করেন। আর এরপর পুলিশ শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। ফলে অনেক শ্রমিক ও পুলিশ হতাহত হয়।

১৮৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের শতবার্ষিকীতে প্যারিসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে ১৮৯০ সাল থেকে শিকাগো প্রতিবাদের বার্ষিকী আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশে পালনের প্রস্তাব করেন রেমন্ড লাভিনে। সেখান থেকেই আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের সূচনা হয়। আর ১৮৯১ সালে প্যারিসেই দ্বিতীয় কংগ্রেসে এই প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। স্বীকৃতি পায় মে দিবস। এরপর ১৯০৪ সালে আমস্টারডাম শহরে অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই উপলক্ষে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি আদায়ের জন্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বজুড়ে পহেলা মে তারিখে মিছিল ও শোভাযাত্রা আয়োজন করতে সকল গণতান্ত্রিক দল এবং ট্রেড ইউনিয়নের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

সেই সম্মেলনে সব শ্রমিক সংগঠন মে মাসের ১ তারিখে ‘বাধ্যতামূলকভাবে কাজ না-করার’ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পর থেকে বিপুল সমারোহে দেশটিতে মে দিবস উদযাপিত হতে থাকে। এই উপলক্ষে দেশটিতে সামরিক কুচকাওয়াজের আয়োজন করা হতো।

অবশ্য যে দেশে ঘটেছিল হে মার্কেটের ঘটনা, সেই যুক্তরাষ্ট্র ও এর পাশাপাশি কানাডায় মে দিবস পালিত হয় না। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবার ‘লেবার ডে’ বা শ্রমিক দিবস পালন করে ওই দুই দেশ। তবে মে দিবসে সরকারি ছুটি থাকে অন্তত ৮০টি দেশে। এর মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে।

এছাড়া আরও অনেক দেশে এটি বেসরকারিভাবে পালিত হয়। এদিকে মে দিবস আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে শ্রমিক শ্রেণির মাঝে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। মালিক-শ্রমিক সম্পর্কে এই দিবসের তাৎপর্য ও প্রভাবসুদূরপ্রসারী। এর ফলে শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় নেমে আসে ৮ ঘণ্টায়। সারা বিশ্বের শ্রমিকরা তাদের শ্রমের উপযুক্ত মর্যাদা পেতে শুরু করেন। নিজেদের অধিকার আদায়ে সফল হয়েছেন।

বিশ্বের ইতিহাসে সংযোজিত হয় সামাজিক পরিবর্তনের নতুন অধ্যায়। মে দিবসের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে শ্রমজীবী মানুষের যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচনা হয়, তার ফলে ধীরে ধীরে লোপ পেতে শুরু করে সামাজিক শ্রেণি-বৈষম্য । শ্রমিকদের বৈষম্য এখনও পুরোপুরি নির্মূল করা না গেলেও মে দিবসের সেই আত্মত্যাগ নিপীড়িত শ্রমজীবী মানুষকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে অনেকটাই মুক্ত করেছে।

অন্য বছরের মতো শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে শ্রমিকদের আত্মত্যাগের এই দিনকে এবছরও পালন করছে বাংলাদেশ। মহান মে দিবস উপলক্ষে পৃথক বাণী দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

রোদে পোড়া শ্রমিক জানে না মে দিবস কি

দ্য রিপোর্ট প্রতিবেদক

বৈশাখের তপ্ত দুপুর। দেশে চলছে ইতিহাসের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। তাপপ্রবাহ প্রতিদিন নতুন রেকর্ড করছে। কিন্তু থেমেই নেই জীবন। এ তপ্ত দুপুরে কাজে ঘেমে-নেয়ে একাকার শ্রমিকেরা।

এ কাজের মজুরি দিয়েই চলে তাদের সংসার। ভোরের আলো ফোটার আগেই শুরু হয়ে যাওয়া কাজ বিরতিহীনভাবে চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত। তাদের অনেকেই মে দিবসের তাৎপর্য জানেন না। শুধু জানেন, তাদের ন্যায্য মজুরির দাবি এখনো উপেক্ষিত, এখনো তাদের বিরাট অংশ মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত। আজ বুধবার পহেলা মে; মহান মে দিবস। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের রক্তঝরা দিন। সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় পালন করা হয় এ মে দিবস। ১৮৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকেরা আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলনে নামেন । ওই দিন অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে গিয়ে কয়েকজন শ্রমিককে জীবন দিতে হয়। এরপর থেকে দিনটি মে দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য শ্রমিকদের আত্মত্যাগের এ দিনটিকে তখন থেকেই সারা বিশ্বে মে দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটি থাকে এ দিন। বাংলাদেশেও আজ সরকারি ছুটি।

মহান মে দিবস পৃথিবীর দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিকভাবে সংহতি ও ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গীকার প্রকাশের দিন। মহান মে দিবস পৃথিবীর সব শ্রমজীবী মানুষের এক অমর প্রেরণার উৎস।

কিন্তু এখনো তপ্ত রোদ উপেক্ষা করে পেশীর দাপটে রক্ত পানি করে যে জীবন যোদ্ধা শ্রমিক, যাদের শ্রমে ঘামে গড়ে ওঠে সভ্যতা, আমাদের যাপিত জীবনের আশ্রয়; যে শ্রমিকের হাতে গড়া অট্টালিকা সেই অট্টালিকায় বসে তাদের কথা ভাবার সময় মেলে না কারো। নাগরিক দুর্ভোগ লাঘবে নিরন্তর খেটে যাওয়া মানুষগুলো উপেক্ষিত থাকবে, এটাই যেন তাদের নিয়তি। একই টুকরি, একই শ্রম, একই কষ্ট। তবুও মজুরির বেলায় লিঙ্গভেদ আর বৈষম্য। যা আজও পোড়ায় মানুষের হৃদয়।

মে দিবস প্রতিষ্ঠার ১৩০ বছরেরও বেশি সময় পরে শ্রম মজুরি, কর্মঘণ্টা ও শোভন কর্মের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হচ্ছে। আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, কোনো ক্ষেত্রেই তাদের মর্যাদা বা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি, জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হয়নি। আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষ এ দিবসে এখনো তাদের অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন করে আসছে। আমাদের দেশের শ্রমিক-কর্মচারীরা এখনো তাদের শ্রমের ন্যায্য মজুরি ও ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত।

নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে সমকাজে সমমজুরি থেকে তারা অনেকটা বঞ্চিত।

আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষ এ দিবসে এখনো তাদের অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন করে আসছে। আমাদের দেশের শ্রমিক-কর্মচারীরা এখনো তাদের শ্রমের ন্যায্য মজুরি ও ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত। নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে সমকাজে সমমজুরি থেকে তারা অনেকটা বঞ্চিত। বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বিগত শতাব্দীর শেষভাগেও আমাদের দেশের শ্রমিক শ্রেণি বিরাট আন্দোলন ও জাগরণ সৃষ্টি করেছিল। এ ব্যাপারে স্মরণীয় ১৯৮৪ সালের শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের(স্কপ) ইতিহাস সৃষ্টিকারী শ্রমিক আন্দোলন। স্কপের ডাকে ২৪ ঘণ্টার সর্বাত্মক শ্রমিক ধর্মঘট সারা দেশকে অচল করে দিয়েছি। তখন সামরিক সরকার বাধ্য হয়েছিল স্কপের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে চুক্তি করতে। এ চুক্তিতে একদিকে শ্রম আইনের যেমন কিছু সংশোধন করা হয়েছিল, এতে নতুন মজুরি কমিশনও গঠন করা হয়েছিল। শ্রমিকদের বোনাসের দাবিরও স্বীকৃতি মিলেছিল। কিন্তু আজ সেই অবস্থা নেই। বিগত দুই দশক দেশে গণতন্ত্র থাকলেও শ্রমিক শ্রেণির জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি বলে মন্তব্য বিশেষজ্ঞদের। তবে সত্যিকার অর্থে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা এবং শিল্পে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আদর্শভিত্তিক সৎ নেতৃত্ব এবং সুস্থ ধারার নিয়মতান্ত্রিকতা প্রয়োজন।

একই সঙ্গে মালিকদেরও শ্রমিকদের প্রতি আস্থা রাখার ফলে শিল্প বিকাশ ও শ্রমিকদের উন্নয়ন সম্ভব বলেই মত অনেকের। দেশের সবচেয়ে শ্রমঘন শিল্প গার্মেন্টস খাতে শ্রমিকদের জন্য সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারিত হলেও সর্বক্ষেত্রে তা অনুসৃত হচ্ছে না বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রের অবস্থা আরো নাজুক। বহু প্রতীক্ষার পর দেশে একটি শ্রম আইন প্রণীত হয়েছে যেখানে কৃষি শ্রমিকরা স্বীকৃতি পেয়েছেন। মহিলা ও পুরুষ গৃহকর্মীদেরও শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার নীতিমালা হচ্ছে। এগুলো আশার কথা। তবে এর বাইরেও অধিকার বঞ্চিত রয়ে গেছেন অনেক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিকরা । শিল্পক্ষেত্রে সুস্থ অবস্থা তৈরির জন্য ও শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও উন্নত জীবনমানের নিশ্চয়তা দেয়ার কোনো বিকল্প নেই। আজকের দিনে আমাদের প্রত্যাশা- শিল্প মালিক, সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সবাই অঙ্গীকারাবদ্ধ হবেন যে, সুস্থ শিল্প বিকাশের স্বার্থে শ্রমিকের মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় শ্রম আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে। অন্যতম প্রধান শ্রম খাত গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করা সময়ের দাবি। দেশের অর্থনীতির আরেকটি বড় নিয়ামক বিদেশে কর্মরত অভিবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স। প্রবাসে এবং স্বদেশে ওই শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার ব্যাপারেও রাষ্ট্রকে দায়িত্বশীল ভূমিকা নেওয়া এখন সময়ের দাবি।

পাল্টে যাওয়া শ্রমিক শ্রেণি: ভাবতে হবে নতুন করে

সেলিম খান

প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় নিজের রাজনৈতিক জীবনের প্রত্যক্ষ একটি অভিজ্ঞতা দিয়েই শুরু করতে হচ্ছে এই নিবন্ধ। তখন আমি উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী। কাজ করি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল) এর জনসংগঠন গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের সক্রিয় কর্মী হিসেবে। আমার কাজের জায়গা প্রধানত পার্টির শ্রমিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন—টাফ এ। সিরাজগঞ্জে তখনও শ্রমিকদের যুথবদ্ধ হয়ে কাজ করবার একটি মাত্র জায়গা হচ্ছে ন্যাশনাল জুট মিলস। যা কিনা স্থানীয়ভাবে কওমী জুট মিল নামেই সমধিক পরিচিত। শ্রমিকসংখ্যা স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলিয়ে হাজার পাঁচেক। যাদের বেশীর ভাগই শ্রেণি বিবেচনায় নিম্নমধ্যবিত্ত কৃষক । কর্মস্থলের আশপাশের আট থেকে দশ কিলোমিটারের মধ্যে তাদের গ্রামের বাড়ি। প্রতিদিনই অনেক দূরত্বের এই পথ মাড়িয়ে তাদেরকে আসা—যাওয়া করতে হয় কর্মস্থলে। এদের অনেকেরই কারখানার আট ঘন্টা শ্রম বিক্রির বাইরে রয়েছে নিজের কিংবা বর্গা নেয়া এক আধটু জমিতে কৃষিকাজের মালিকানা। সঙ্গত কারণেই কাজ শেষের সাইরেন বাজবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি যাবার তাগিদ তাদের নিত্য তাড়না। শ্রেণি চাহিদায় সাংঘাতিক রকমের দোদুল্যমান চিত্তের অধিকারী এসব আধা শ্রমিক আধা কৃষক মানুষগুলোকে নিয়েই স্বপ্ন দেখি রাষ্ট্র পাল্টে দেওয়ার। অনেক সময়েই সংগঠনের কাজের কথা উঠলেই এসব শ্রমিকের অনেকেই বলে বসেন, নিজের জমিতে কিংবা বর্গাতে ধান লাগাতে শ্রমিক ভাড়া করেছেন। সেখানে না গেলে চলবে না। যাইহোক এমনিভাবেই চলতে থাকে সংগঠনের কাজ। এরই মধ্যে চলে আসে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কনভেনশন। ঢাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার থিয়েটার মিলনায়তনে।

সারা দেশ থেকেই আসছেন টাফের ছাতাতলে সমবেত শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিরা। যথারীতি আমাকেও আসতে হয় ঢাকায়। বয়সের তুলনায় আমিই সম্ভবত সব থেকে কনিষ্ঠ শ্রমিক প্রতিনিধি। মফস্বলের একজন তরুণ । রাজনীতির তত্বীয় ঋদ্ধতা একেবারেই কম। যা কিছু অভিজ্ঞতা তার বেশীর ভাগই মাঠের। তারপরও রিপোর্ট তো একটা পেশ করতেই হবে। তাই এ ফোর সাইজের এক পৃষ্ঠাজুড়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেই এনেছিলাম । সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে সংগঠনের কাজের বিস্তৃতি সম্পর্কে আগে থেকেই অনেকটা ওয়াকিবহাল ছিলেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তাই শুরুর দিকেই ডাক পড়লো আমার।

মঞ্চে উপবিষ্ট কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ কমরেড বদরুদ্দিন উমর, শাহ আতিউল ইসলাম, আনু মুহম্মদসহ পার্টি ও শ্রমিক ফ্রন্ট ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের অন্য নেতৃবৃন্দ। আমি বেশ ভীরু মনেই এগিয়ে গেলাম পোডিয়ামের দিকে। আমার আগে যারা প্রতিবেদন পেশ করেছেন তাদেরগুলো ছিল বেশ ভারী এবং তত্ত্বকথায় ঋদ্ধ। সে তুলনায় আমার প্রতিবেদনতো মাত্র এক পৃষ্ঠার। তাও আবার বেশ আনাড়ি কলমে লেখা। যাই হোক এক পৃষ্ঠার প্রথম দুই কি তিন পরতে সংগঠনের কায়িক বিস্তার আর একেবারে শেষ পরতে ছিল আমার একটি জিজ্ঞাসা। আর সেটি ছিল 'আমরা শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে বিদ্যমান দুবৃত্তয়ান রাষ্টকে উপড়ে ফেলে যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তৈরি করতে চাই, আদর্শ যেই শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য পার্টির লেখা আর বয়ানে জানতে পাই এবং জানানো হয়—সেই শ্রমিককে তো কাজ করতে গিয়ে পাই না।

দু:খজনক হলেও সত্যি যে সেই কনভেনশনে তো বটেই, আজও আমার সাবেক সেই সংগঠনের নেতৃবৃন্দের তরফ থেকে কিংবা বাংলাদেশের বামপন্থীদের তরফ থেকে আমি সেই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর পাইনি। তাই বলে সেই সদুত্তর পাওয়ার খোঁজে প্রক্রিয়া থেমে থাকেনি আমার। সেই প্রয়াসের কথা জানাতেই নিজের উপরোল্লিখিত বয়ানটুকু পড়তে বাধ্য করতে হলো পাঠককে। যার জন্য অবশ্যই ক্ষমাপ্রার্থী।

যাইহোক, নিরন্তর খোঁজ প্রক্রিয়ার এক পর্যায়ে হঠাৎই একদিন প্রথম আলো পত্রিকাতে "প্রিকারিয়েত : সবচেয়ে বিপজ্জনক শ্রেণি" শিরোনামে একটি একটি লেখা চোখে পড়ে আমার। লেখাটির প্রণেতা ফারুক ওয়াসিফ। ফারুক নিজেও রাজনৈতিকভাবে ছিলেন বদরুদ্দিন উমরদের দলের সঙ্গে যুক্ত, যতটা আমার জানা। লেখাটি পড়বার পর আমার প্রশ্নের উত্তর পাবার একটি কিনারা হয় বটে। পাশাপাশি বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতিতে একেবারেই অচেনা অজানা এই প্রপঞ্চটি (প্রিকারিয়েত) সম্পর্কে জানবার আগ্রহ বেড়ে যায় আমার । কেননা সেই উনিশ শ বিরাশি সালে টাফ এর কনভেনশনে উপস্থাপিত আমার যে জিজ্ঞাসা, আসলে আমরা দলের বয়ানে ও রাজনীতিতে যে শ্রমিকের সংজ্ঞায়ন জেনেছি এবং আমাদেরকে জানানো হয়েছে সেটিতো মাঠের রাজনৈতিক কার্যক্রমে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এরা তো কার্ল মার্কসের সংজ্ঞায়িত সেই 'প্রলেতারিয়েত' নয়, যাদের রয়েছে মালিক কতৃর্পক্ষের স্বাক্ষরে দেয়া নির্দিষ্ট একটি পরিচয়পত্র বা সনাক্তকরণে লিখিত শক্ত কাগজের কার্ড, রয়েছে পরের দিন শ্রম দেবার জন্য নূন্যতম খাবার, স্বাস্থ্যসুবিধা, বিনোদনের উন্মাতাল কদর্য ব্যবস্থা, আর গাদাগাদি করে থাকবার মতো একটি সমষ্টিক আবাসন।

এদের কাছে শ্রম বিক্রি করবার কারখানাটি আসলে নিজের মালিকানায় থাকা একখন্ড ভূমি আর পরিবারকে আরো ভালো রাখবার জন্য বিকল্প একটি উপায় মাত্র। তাইতো কওমী জুট মিলের শ্রমিককে যখন বলতাম, কাদের ভাই চলেন... মিছিলে যাই... তখন তার বিনীত অনুরোধ... ' সেলিম ভাই, আজকে আমারে বাদ দেয়া যায় না। ইরি ক্ষেতে দুইজন শ্রমিক লাগিয়েছি, ওদের সঙ্গে হাত না লাগালে কাজটা শেষ হবে না।' তখন আমার পার্টি বয়ানে ঋদ্ধ তত্ত্বের খামতিটা বেশ প্রকট হয়ে ওঠে আমার কাছে। প্রশ্নটা তীরের মতো ছুটে আসে আমার দিকে, আমাকে জানতে বলে, 'তাহলে বাংলাদেশে যে শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠায় আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করানো হয়েছে, আমরা জীবন বাজি রেখেছি যে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। সেই শ্রমিক কোথায়?

ফারুকের লেখায় সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজবার প্রয়াসটা আরও জোরালো হয় আমার মাঝে। যখন ফারুক লেখেন, "সবখানেই নতুন এক শ্রেণি উঠে দাঁড়াচ্ছে। এদের বলা হচ্ছে প্রিকারিয়েত। গত শতকে যেমন প্রলেতারিয়েত তথা শ্রমিকশ্রেণি ছিল পুঁজিবাদ ও স্বৈরাচারবিরোধী লড়াইয়ের সামনে সারিতে; সহস্রাব্দের পর তাদের জায়গা নিয়েছে প্রিকারিয়েত তথা শহুরে নিম্নবর্গ। আমার কাছে তখন আমার রাজনৈতিক বন্ধু তথা কমরেডদেরকে ফারুকের বর্ণনামতো 'শহুরে নিম্নবর্গ' মনে হয়নি। তবে মাত্র ষোল কি সতেরো বছরের এক রাজনৈতিক

কমীর্র কাছে তখন কাদের ভাইয়ের মতো কমরেডদেরকে ‘মালিকানা’ বোধে আক্রান্ত মধ্যবিত্ত হয়ে উঠতে প্রয়াসি সাময়িক ‘শ্রমিক’ এর থেকে বেশী কিছু মনে হয়নি। যারা কারখানাতে কাজ করলেও যাদের মন স্বপ্ন বোনে, পরবর্তী প্রজন্ম যেন হয় শিক্ষিত, সরকারের পোষ্য তথা চাকরিজীবী, কিংবা ছোট বা মাঝারি ব্যবসায়ী, আর তা না হলেও ধারকর্জ আর বাবার জমানো টাকায় পাড়ি জমাবে বিদেশের শ্রমবাজারেও, পাঠাবে প্রবাসি আয় আর এসবেই পুঁজিতন্ত্রের আয়নায় মালিকানাবোধে আক্রান্ত মন প্রতিচ্ছবি দেখবে অনেকটা নিশ্চিন্ত এক মধ্যবিত্ত পারিবারিক কাঠামোর। তাই শেষ বিচারে আমার বিপ্লবী মমন এমনও ধরেই নিয়েছে, ‘এদের দ্বারা আর যাই হোক, শ্রমিকরাজ তথা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবার নয়।’

আমরা রাজনৈতিক মনে এমন বয়ান জোরালো হয়—যে শ্রমিক শ্রেণি ৮ ঘন্টা শ্রমদিবসের স্বীকৃতির দাবিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ১৮৮৬ সালের পয়লা মে তারিখে। যাদের রক্তে কেনা হয়েছিল আট ঘন্টা শ্রমদিবস। সেই শ্রমিকতো আজকের বাংলাদেশের শ্রমিকেরা নন। নিজের কাছেই প্রশ্নবানে জর্জরিত হই—যে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে বিপ্লব হয়েছিল জার সাম্রাজ্য রাশিয়াতে। ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের নেতৃত্বে যে শ্রমিকেরা সম্ভব করেছিল বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠাকে । সেই শ্রমিক কী বাংলাদেশের শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পুরোভাগে?

তবে বিরাশি থেকে আজকের দুই হাজার চব্বিশ দীর্ঘ এই চুয়াল্লিশ বছরে পাল্টেছে বিশ্বব্যবস্থা, পুঁজিতন্ত্রে ফিরে গেছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সদৃশ্য আর্থ—রাজনীতির রাষ্ট্রগুলো, পাল্টেছে বাংলাদেশ, পাল্টেছে দেশের আর্থ—রাজনীতি। অবকাঠামোগত উন্নয়নে গ্রামগুলোও আর নেই গ্রামের বৈশিষ্টে। বিশেষ করে বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রাম আর সংগ্রামজাত রাষ্ট্রকাঠামোর কল্যাণে তৈরি হয়েছিল যে উৎকর্ষ মনন। তৈরি হয়েছিল যে মানবিক মানুষ। যারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল ‘আমি’ বা ‘আমার’বলে কিছু নেই। যা কিছু সবই ‘আমাদের।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে উদ্ভব হয় যে বিশ্বায়ন প্রপঞ্চের, সেই প্রপঞ্চ উসকে দিয়েছে স্বার্থপরতার অর্থনীতিকে। বিভাজিত হয়ে পড়েছে যুথবদ্ধ বৃহৎ পরিসরের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া। পাল্টে গেছে পুঁজিবাদী উৎপাদন—সম্পর্ক। “তথ্যপ্রযুক্তি, মুক্তবাজার অর্থনীতি, নব্য উদারবাদী অর্থব্যবস্থা, পণ্য ও সেবার বিশ্বময় অবাধ চলাচল এবং বাজারজাতকরণের পুঁজিবাদী আয়োজন সত্তরের দশক থেকে দ্রুত বলীয়ান হয়েছে। বর্তমান সময়ের বানিজ্যের ধরণ ষাটের দশকের চেয়ে একেবারে আলাদা। শিল্পোৎপাদনের জন্য ভূমি—শ্রম—মূলধন—সংগঠনের ধ্রুপদী নিয়ম আর মানা প্রয়োজন নেই। সহজ উদাহরণ নাইকি, টমি হিলফিগার, র‍্যাংলার, অ্যাডিডাস ইত্যাদি বহুজাতিকের মূল যে দেশ; সেখানে কোনো কারখানার প্রয়োজন নেই। একটি বা কয়েকটি ঘর নিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কয়েকটি কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ এবং কয়েকজন বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ থাকলেই চলে। এ হেন কোম্পানির জন্য পোশাক, জুতা বা অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদন করে দেবে অন্যান্য দেশ। যেমন বাংলাদেশ, ভারত, চীন, ভিয়েতনাম,

থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, মেক্সিকো, ব্রাজিল, হন্ডুরাস, হাইতি, নাইজেরিয়া ইত্যাদি। সোজা কথা, একসময়ের তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষুধা কাজে লাগানো সহজ। তাদের দিয়েই, তাদের ভূমি—শ্রম—সংগঠন ব্যবহার করেই আকাশছোঁয়া মুনাফা কামানো সম্ভব। শুধু পুঁজি আর আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা থাকলেই চলে। এই পদ্ধতির ইংরেজি নাম 'আউটসোর্সিং। মূল কথা, অন্যদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার অর্থনীতি। যে অর্থনীতি খোলনলচে বদলে দিয়েছে চিরাচরিত শ্রমনির্ভর জীবন—জীবিকার। 'আউটসোর্সিং' নির্ভর এই অর্থনৈতিক পথপদ্ধতিতে জীবন—জীবিকার খোঁজে হন্যি হয়ে ফিরছে বিশ্বময় এক বেদুইন জাতি। "কাজের সন্ধানে তারা সীমান্ত, সাগর, পর্বত পেরোচ্ছে। ছেলেমেয়েদের শহরে এনে ফেলছে জীবিকার চুম্বক। টাকার টানে বদলে যাচ্ছে মন আর চলনবলন। কিন্তু সেই চুম্বক যত টানে, তত কাছে নেয় না। মেটায় না চাহিদা, পুরায় না স্বপ্ন। স্বদেশে পরবাসী আর পরবাসে 'রাষ্ট্রহীন' হয়ে পড়া এই তরুণদের স্বপ্ন দেখিয়ে পরিত্যাগ করেছে অর্থনীতি ——যার মূল নাম পুঁজিবাদ।

প্রিকারিয়েত কারা

ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের বেঁচে থাকবার অন্যতম উপায় হয়ে ওঠা 'আউটসোসিং' নির্ভর এই অর্থনীতির শিকার যে শুধু কম উন্নত কিংবা অনুন্নত বিশ্বের মানুষই তা কিন্তু নয়। ধাপ্পাবাজির এই অর্থনীতির শিকার উন্নত বিশ্বের ক্ষমতাবৃত্তের পরিধিতে থাকা অসংখ্য মানুষও। বিশ্বময় বিশাল এই জনগোষ্ঠিই হচ্ছে প্রিকারিয়েত। "যাদের নেই কোনো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুঁজি (অর্থকড়ির টানাটানি ছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদীক্ষাহীনতা, যোগাযোগের সক্ষমতা না থাকা, বৃহত্তর বহির্বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা না থাকা, সম্পর্কের গণ্ডি সীমিত থাকা) এমন বৈশিষ্টগুলোই এদেরকে প্রিকারিয়েত হতে বাধ্য করছে।"

হেলাল মহিউদ্দীনের বয়ানে, "প্রিকারিয়েত মূলত সাধারণ যুবজনতা। শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদে শ্রমিক ও পেশাজীবীর জীবনে শোষণ থাকলেও নির্দিষ্ট পেশায় নির্দিষ্ট স্থানে বাঁধাধরা জীবনের নিশ্চয়তা ছিল। ভবিষ্যতের রূপরেখা ছিল। এদের বলা হতো প্রলেতারিয়েত। রূপান্তরিত পুঁজিবাদের বাজার অর্থনীতিতে বিপুলসংখ্যক মানুষের কাজ—বসবাস ও জীবনধারা আর নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আটকে নেই, নেই চাকরি ও কাজের স্থায়িত্ব। আশা—নিরাশার দোলাচল এদের নিত্যসঙ্গী। অস্থিতিশীলতার জীবনে গতির চাইতে দুর্গতি বেশী। যখন সমাজে হতাশা, অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা, রাজনীতিতে অমানবিকতা, তখন ভবিষ্যতের ভরসাও নাগালের বাইরে । ইতালিতে পরিচিত দুস্থজনের সাধু প্রিকারিয়েতের নামে সমাজবিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন প্রিকারিয়েত । এরা বিপন্ন আবার বিপজ্জনকও। নতুন পাওয়া শিক্ষা ও ফেসবুক—টুইটার—হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে এরা দ্রুত জমায়েত হওয়া শিখছে। অস্থায়ী চাকরি, অনিশ্চিত ভবিষ্যত এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তাদের মধ্যে যে ক্রোধ তৈরি করে, বৈরী সরকারের বিরুদ্ধে সেটাই তারা উগরে দেয়। এরাই অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন করে, তাহরির থেকে তাকসিম স্কয়ারে ঘটায় গণবিদ্রোহ।

বাংলায় প্রিকারিয়েত

আমরা যারা ‘প্রলেতারিয়েত’ শব্দটির সঙ্গে পরিচিত। তারা শুরু থেকেই এই শব্দটির বাংলা অর্থ জেনে এসেছি ‘সর্বহারা’। কিন্তু আসলেই কী প্রয়েতারিয়েত শব্দটির বাংলা অর্থ সর্বহারা? কার্ল মার্কসের ‘প্রলেতারিয়েত’ ধারণাটি শিল্পসমাজে মূলত বিত্তহীন বা স্বল্পবিত্ত শ্রম বিক্রেতা শ্রেণি হিসেবেই অভিহিত। শিল্পসমাজে কারখানাকে কর্মস্থল ধরে যে বঞ্চিত ও শোষিত শ্রেণিকে কার্ল মার্কস ‘সর্বহারা’ নাম দেন, তারা বস্তুগত অর্থে ততটা সর্বহারা নন। উৎপাদনযন্ত্রের মালিকানায় কোনো শরিকানা নেই বলে ন্যায্য পাওনাটুকু চাইতে না পারার অক্ষমতাই মূলত সর্বহারার লক্ষণ। মজুরির নিয়ন্তা মজুরিদাতা মালিক, তিনিই ঠিক করেন মজুরির পরিমাণ । মজুরিকে সামাজিক উৎপাদন সম্পর্কের অপরিহার্য অংশ গণ্য না করে নিছক বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত করতে পারার ক্ষমতাই পুঁজিবাদের মুল শক্তি। শিল্পসমাজে নিজেদের মজুরির ন্যায্যতা নিশ্চিত করার সক্ষমতা রয়েছে শ্রমিকদের। শুধুই মজুরির ন্যায্যতাই নয়, আবাসন, স্বাস্থ্যসুবিধার মতো অন্যান্য সুবিধা আদায়ে মালিকের সঙ্গে দরকষাকষি তথা বারগেইন করবারও আইনী অধিকার রয়েছে তাদের। কিন্তু আজকের বিশ্বায়নের যুগে ‘আউটসোর্সিং’ নির্ভর অর্থনীতিতে শ্রমিকদের এমনতর অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করবার সক্ষমতা নেই বললেই চলে। বাজার অর্থনীতিতে এই শ্রমবিক্রেতা গোষ্ঠির নিশ্চিত ও স্থায়ী কোন অবস্থান নেই । ন্যায্যতা আদায়ে তাদের নেই কোনো দরকষাকষির সক্ষমতা। সহজেই নিজেদের কর্মস্থল পরিবর্তনে সমর্থ শ্রমজীবী এই গোষ্ঠিকেই বলা হচ্ছে ‘প্রিকারিয়েত’ বা ‘প্রিকারিয়াস প্রলেতারিয়েত’।

ইংরেজি ‘প্রিকারিয়াস’ শব্দের জুতসই বাংলা প্রতিশব্দ নেই। ভেঙে বললে ‘অনিশ্চিত’, ‘অনির্ভরযোগ্য’, ‘অনিয়ন্ত্রণযোগ্য’, ‘অনিয়মশীল’, ‘অপরিণতিশীল’, ‘অপরিকল্পনাযোগ্য’, ‘এবড়োথেবড়ো’, ‘এলোপাতাড়ি’, ‘এলোমেলো’, ইত্যাদি ভাবের মিশেল বলা যেতে পারে। মূলত জীবিকাদায়ী খাটুনির প্রেক্ষিতেই শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। ইংরেজিতে ‘প্রিকারিয়াস জব’, ‘প্রিকারিয়াস ওয়ার্ক অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট’ শব্দগুচ্ছের ব্যবহার তো নিয়মিতই নজরে আসে। ভারত ও বাংলাদেশের বড় শহরগুলোতে সকালবেলা নির্দিষ্ট কোনো স্থানে ঝুড়ি, কোদাল কিংবা কাজের জন্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ারাদি নিয়ে একদল মানুষ জড়ো হন দিনচুক্তিতে ঠিকা কাজ পাওয়ার জন্য। শ্রম ছাড়া তাঁদের আর কিছুই বিক্রিযোগ্য নয়। কাজ পেলে কোনোভাবে কষ্টেসৃষ্টে বেঁচেবর্তে থাকা। না পেলে উপোস করা। কাজ পেলেও দিনের মাঝপথে ‘কাজ ভালো হচ্ছে না’ অজুহাতে ঠিকাদারকর্তা কাজ থেকে সরিয়েও দিতে পারেন। এমন বিবেচনায় এসব শ্রমিকদেরকে ‘ভাসমান’ কিংবা ‘পরিযায়ী’ বলা যেতে পারে। কেননা এরা আজ এখানে তো কাল অন্যখানে। আবার প্রাযুক্তিক উন্নয়নে জানা দক্ষতায় কাজ মিলছে না । ছাড়তে হচ্ছে দীর্ঘদিনের পেশা। বাধ্য হচ্ছেন অন্য পেশা বেছে নিতে। এছাড়া আজ কাজ করছেন এক ঠিকাদারের অধীনে তো কাল অন্য ঠিকাদার তাদেরকে কিনে নিয়ে যাচ্ছে। যে কারণে পরিযায়ী এসব দিনমজুরদের পক্ষে সংগঠিত হওয়া সম্ভব হয় না। গঠন করতে পারে না কোনো সংগঠন বা সমিতি। প্রতিনিয়ত

করতে পারে না কোনো সংগঠন বা সমিতি। প্রতিনিয়ত অভিবাসনমুখী হওয়ায় এসব শ্রমবিক্রেতাকে ধ্রুপদী অর্থে শ্রমিকও বলা যায় না।

বাংলাদেশে শ্রমজীবী গোষ্ঠির বৈশিষ্ট্যের এমন বদল রাজনৈতিকভাবে পর্যবেক্ষণে না আসলেও সামাজিক চোখে কিন্তু অনেকটাই পরিচিতি ঘটে গেছে এদের। বিশাল অশিক্ষিত এই জনগোষ্ঠির সঙ্গে যোগ হয়েছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুঁজির অধিকারী প্রিকারিয়েত তথা শিক্ষিত শ্রমজীবী মানুষের। শিক্ষিত এবং সামাজিক অবস্থানের কারণে এরা নিজের এলাকায় শ্রম বিক্রি করতে পারছেন না বটে। তাই এই জনগোষ্ঠির অনেকেই পাড়ি জমাচ্ছেন রাজধানীসহ বিভাগীয় শহরগুলোতে। কলেজ—বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়েও কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন ট্যাক্সি বা মোটরসাইকেল রাইডার হিসেবে। করছেন ফুড ডেলিভারির কাজ। কেউ বা কুরিয়ার সার্ভিসের পোস্টম্যান, রেস্তোরাঁর বেয়ারা, দূরযাত্রার বাসের কন্ডাক্টর বা সুপারভাইজার কিংবা কল সেন্টার ও টেলিমার্কেটিং অথবা ফ্রিল্যান্সিং ধরনের সাময়িক পেশায় নিয়োজিত করছেন নিজেদেরকে। জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের বাইরে নিরান্দময়, অপ্রচলিত, অপছন্দের, অর্থহীন ও মনঃসংযোগ—বিবর্জিত ক্লান্তিকর এবং একেঁঘয়ে এসব কাজের নাম দিয়েছেন 'বুলশিট জবস' বা বাজে কাজ। গ্রেবার এই ধরণের কাজের বিস্তৃতি বাড়ার মাত্রাকে সামাজিক বিপর্যয়ের আসন্ন কারণ হিসেবে অভিহিত করছেন, সতর্ক করছেন আমাদেরকে। ব্রিটিশ সামাজিক অর্থনীতিবিদ গাই স্ট্যান্ডিং সামাজিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে ওঠা শ্রমজীবী এই জনগোষ্ঠিকে আখ্যায়িত করছেন 'আ ডেঞ্জারাস ক্লাস' বা 'বিপজ্জনক শ্রেণি' হিসেবে। শুধুই জীবিকার প্রয়োজনে নৈতিক ও মানসিক উত্থান—পতন—চড়াই—উতরাইয়ে বিধ্বস্ত এই শ্রেণির নাম দিয়েছেন 'দ্য ভালনেরাবল ডিমনস' বা 'বিপন্ন দানবকুল'। অন্যদিকে প্রিকারিয়ান বা প্রিকারিয়েতদের 'মানবসম্পদের জন্য নয়া হুমকি' হিসেবে দেখছেন ক্রাইনেট মার্কেটিং সলিউশনের শীর্ষ কর্মকর্তা সের্গেই গলুবেভ। মুক্তবাজার অর্থনীতি ক্ষমতাবানদের জন্য উন্মুক্ত বাজার সৃষ্টি করলেও সামাজিক ন্যায্যতানির্ভর শ্রমব্যবস্থাপনাকে এড়িয়ে চলে। 'নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও', 'বাকির খাতা শূন্য থাক'; এ ধরনের দর্শন প্রিকারিয়েতদেরকে কাঁচা অর্থ উপার্জনের দৌঁড়ে মাতিয়ে রাখে।

শ্রেণি অবস্থান

আসলে বিশ্বায়নের এই গোলকধাঁধায় পরিবৃত্ত প্রিকারিয়েতদের একক কোনো শ্রেণিতে পরিণত হওয়ার সুযোগই নেই। ভোক্তা হিসেবে প্রিকারিয়েতও গ্লোবাল বা বৈশ্বিক পর্যায়ের ক্রেতা। কিন্তু আয়—উপার্জন ও সর্বহারা বৈশিষ্ট্যে তারা একান্তই লোকাল বা স্থানীয়। আপ্পাদুরাই বৈশ্বিকতা ও স্থানীয়তার এই অসম মিশেলের নাম দিয়েছেন 'গ্লোবালাইজেশন'। প্রিকারিয়েত বিশ্বায়নের অংশ হওয়ার বদলে গ্লোবালাইজেশনের পাঁকে আটকা পড়ে যাচ্ছে। 'ম্যাকডোনাল্ড' ফাস্টফুড চেইন পৃথিবীর অন্যতম বড় প্রিকারিয়েত তৈরির কারখানা, যেখানে স্থায়ী চাকরি বলে কিছু নেই। বিশ্বায়ন ভোক্তামানস তৈরি করলেও ভোগবাদী জীবনযাপনের সামর্থ্য

তৈরি করছে না। উল্টো সেই সম্ভাবনাকে সুদূরপরাহত করছে। অস্থায়ী ও অনিশ্চিত শ্রমবাজারের বিস্তৃতি বাড়ছে বৈ কমছে না। এমন শ্রমবাজারে শ্রমবিক্রেতাদেরকে গাই স্ট্যান্ডিং বলছেন, 'নিউ ডেঞ্জারাস ক্লাস। বললেন, এদের সামাজিক প্রতিক্রিয়া সবসময়ই পশ্চাদমূখি। তাইতো বর্তমান জীবনযাত্রার প্রতি অসন্তোষ—অতৃপ্তি নিয়েই তাঁদের দিন কাটে। সময়—সময় তারা ফেটে পড়ে বিদ্রোহে।

তবে এমনতর শ্রম বৈশিষ্ট্যের প্রশ্নে প্রিকারিয়েতদের অসহায় উত্তর হচ্ছে 'কী করবো ভাই, উপায় নেই। এই ধরণের উপায়হীনতা প্রিকারিয়াতায়নের অন্যতম কারণ বলছেন গাই স্টান্ডিং বলছেন, উপায়হীনতা তাঁদেরকে 'অ্যাটাভিষ্ট' (পশ্চাৎপন্থী) ও 'রোমো' (যাযাবর) দলভূক্ত হতে বাধ্য করে। তাইতো পশ্চাৎপন্থী, রক্ষণশীল, ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রিকারিয়েত আশ্রয় খোঁজে প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের পেছনে। এদের সমর্থনে উত্থাণ ঘটে ডোনাল্ড ট্রাম্প, নরেন্দ্র মোদি ও দুতার্তোর মতো জনতুষ্টিবাদি নেতার। তবে প্রিকারিয়েতদের সবাই যে পশ্চাৎপন্থী, রক্ষণশীল কিংবা প্রতিক্রিয়াশীল তা নয়। এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত অংশটি বেছে নেয় কিংবা নেয়ার চেষ্টা করে বিপরীত কোনো পথ। এক্ষেত্রে তাঁরা আমেরিকান সমাজতন্ত্রী নেতা বার্নি স্যান্ডার্স বা ব্রিটেনের জেরেমি করবিনের মতো প্রগতিশীল নেতৃত্বের মধ্যে আশার পথ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেন। অনেক সময়ে আবার তারা বিদ্রোহ বিক্ষোভের মাধ্যমেও নিজেদের এমন কি সামাজিক পরিবর্তনের উপায়ও দেখে থাকেন। এসব বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, ভবিষ্যতে বিত্তবান ও প্রিকারিয়েতদের মধ্যে এক ধরনের সংঘাতের সম্ভাবনা টের পাওয়া যায়।

প্রিকারিয়েতরা কখনো রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ' শ্রেণি' হয়ে উঠবে কি না সেটি হয়তো সময়ই বলে দেবে। তবে বিষয়টি নিয়ে ভাববার যথেষ্ট কারণ ও দায় রয়েছে আমাদের দেশের প্রগতিবাদী নেতৃত্বের। বিশেষ করে বাংলাদেশকে দুর্বৃত্তায়নমুক্ত একটি মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার কাজে যারা নিজেদেরকে দীর্ঘদিন ধরে নিয়োজিত রেখেছেন।

লেখক : সাংবাদিক, মানবিক রাষ্ট্র নির্মাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন রাজনৈতিক কর্মী।

মে দিবস ও বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণি

মাহবুব আলম

মে দিবস

মে দিবস হলো শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিক উৎসব। শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম শপথ ও আন্তর্জাতিক সংহতির দিন। সারা দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণির সঙ্গে বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণিও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এই দিনটি পালন করেন। দিনটি সরকারি ছুটির দিন। এমন কী সংবাদপত্রেও এ দিনটিতে বাধ্যতামূলক ছুটি থাকে। মজুরি ও দাসত্বের দিক থেকে গার্মেন্ট শ্রমিকদের চাইতেও নিম্নতর বিপজ্জনক অবস্থায় অবস্থান করা সাংবাদিক কর্মচারীরা এদিন মুক্তির নিঃশ্বাস নিয়ে স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ পরিবার পরিজনের সাথে আনন্দে মেতে ওঠে। মে দিবসের লক্ষ্য হলো পুঁজিবাদের ধ্বংস সাধন। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের মধ্যদিয়ে এই ধ্বংস সাধন হয়েছিল। তারপর যা হয় তা হলো শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে বিশ্বের বুকে সর্বপ্রথম সর্বহারার ক্ষমতায়ন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সেই রুশ বিপ্লবের সাফল্য ৭০ বছরের বেশি ধরে রাখতে পারেনি রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণি। ঠিক যেমন করে ফরাসিরা ধরে রাখতে পারেনি ফরাসি বিপ্লবের সাফল্য। ১৯৯১ সালে রুশ বিপ্লবের ফসল সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। সেই দেশে আবারও পুঁজিবাদের উত্থান ঘটে। পূর্ব ইউরোপসহ বিশ্বের আরো অনেক দেশেই শ্রমিক শ্রেণি পরাজিত হয় ও পূঁজিবাদের উত্থান ঘটে। অবশ্য সে এক দীর্ঘ চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের ইতিহাস। আজকের বিষয় মে দিবস ও শ্রমিক শ্রেণি। এই মে দিবসের কালজয়ী আন্দোলন সংগ্রামের সূত্রপাত হয়েছিল আজ থেকে ১৬০ বছর আগে, ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে।

মে দিবসের ইতিহাস

১৮৮৬ সালের পহেলা মে দিনটি ছিল শনিবার। ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে এদিন শিকাগোসহ আমেরিকার প্রায় সকল শহরের শিল্পাঞ্চলে সফল ধর্মঘট হয়। আমেরিকার সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী ওই দিনের ধর্মঘটে ৩ লাখ ৪০ হাজার শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে শিকাগো শহরের মিছিল অংশ নেন ৮০ হাজার শ্রমিক। স্বতঃস্ফুর্ত ু শান্তিপূর্ণভাবে প্রথমদিনের ধর্মঘট ও বিক্ষোভ সমাবেশ সফল হয়। পরের দিন ছিল রবিবার , সরকারি ছুটির দিন । ছুটির পর দিন ৩ মে ধর্মঘট আরো ব্যাপকতা লাভ করে। তাতে ভীত সন্ত্রস্ত পুলিশ ও মালিকদের দালালরা চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র শুরু করে। চক্রান্তের অংশ হিসেবে ৩রা মে শ্রমিক সমাবেশে পুলিশ গুলি বর্ষণ করে।পুলিশের গুলিতে ৬ জনের মৃত্যু হয়। এই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ৪ মে হেমার্কেট স্কয়ারে এক বিশাল শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশ পণ্ড করতে মালিকদের ভাড়াটিয়া গুণ্ডাবাহিনী বোমা নিক্ষেপ করে। তার সঙ্গে শুরু হয় পুলিশের গুলি বর্ষণ। পুলিশের গুলিতে তাৎক্ষণিকভাবে ৪ শ্রমিকের মৃত্যু হয়। আহত হন অসংখ্য শ্রমিক। এই অবস্থায় শুরু হয় পুলিশের সাথে শ্রমিকদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। সংঘর্ষে শিকাগোর হে মার্কেট রক্তের বন্যায় ভেসে যায়। নিহত হন ৭ পুলিশও। ইতিহাসে এই ঘটনা হে মার্কেট ট্রাজেডি হিসেবে চিহ্নিত হয়।

এই হত্যাকাণ্ডের পর শ্রমিকরা ভীত সন্ত্রস্ত না হয়ে তারা তাদের আন্দোলন সংগ্রাম আরো জোরদার করে। আন্দোলন সংগ্রামকে আরো এগিয়ে নেয়।

শেষ পর্যন্ত সংগ্রামে বিজয় অর্জন করে। এজন্য শ্রমিকদের আরো সংগ্রাম করতে হয়েছে, দিতে হয়েছে আরো রক্ত। কারণ এই ঘটনার পর শ্রমিকদের ওপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ভয়াবহ রূপ লাভ করে। সেই সময় আমেরিকার বিভিন্ন সংবাদপত্র এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে সর্বাত্মক সমর্থন ও মদদ দান করে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে আন্দোলনরত শ্রমিকদের কমিউনিস্ট হিসেবে বর্ণনা করে বলা হয়, 'প্রতিটি ল্যাম্পপোস্ট কমিউনিস্টদের লাশ দ্বারা সজ্জিত করা হোক।' শিকাগো ট্রিবিউন ধর্মঘটী শ্রমিকদের প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়ার দাবি জানায়। শুধু তাই নয়, শ্রমিকদের খুন করলো যারা তাদের বিচার হলো না। বিচার হলো শ্রমিক নেতাদের। বিচারতো নয় প্রহসন হলো। ৪ শ্রমিক নেতাকে ফাঁসি দেওয়া হলো। ফিশার, এন্জেল ,স্পাইজ ও পার্সলস- শ্রমিক শ্রেণির চার বীর নেতা নির্ভীকচিত্তে ফাঁসির মঞ্চে জীবন দিলেন।

শিকাগোর শ্রমিকদের এই লড়াই ব্যর্থ হয়নি। তাইতো ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে পহেলা মে কে শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস হিসেবে ঘোষনা করা হয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত পহেলা মে শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এই দিবসে সারা দুনিয়ার সর্বত্র এক আওয়াজ হয় ' দুনিয়ার মজদুর এক হও'। তাই আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে মে দিবস অত্যন্ত তাৎপর্য, পূর্ণ ঘটনা।

উল্লেখ্য, শুধু আমেরিকার হে মার্কেট শ্রমিকদের রক্তে রঞ্জিত হয়নি। শ্রমিকদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সড়ক- মহাসড়ক।

এর মধ্যে ফ্রান্সে একদিনে ৫০ জন শ্রমিকের নিহত হওয়ার ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মে দিবসের শ্রমিক সমাবেশে এই বর্বর হত্যাকান্ড হয় ফ্রান্সের ফারমিন্স শহরে।

মে দিবস ও বাংলাদেশের শ্রমিক

সরকারিভাবে মে দিবসকে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও মে দিবসের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের মধ্যে বাংলাদেশে বিস্তর ফারাক রয়েছে।

৮ শ্রমঘন্টার দাবিও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী কাউকে ৮ ঘন্টার বেশি কাজ করানো যাবে না। এমন কী আমাদের দেশের শ্রম আইনেও বলা হয়েছে, কোনো শ্রমিককে ৮ ঘন্টার বেশি কাজ করানো যাবে না। কিন্তু এটা কেতাবে লেখা আছে। বাস্তবে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও শিল্প কারখানায় শ্রমিক কর্মচারীদের নির্বিঘ্নে ৯/১০ এমন কী আরো বেশি সময় কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে গার্মেন্ট, হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট শ্রমিকদের অবস্থা ভয়াবহ।

পশ্চিমা বিশ্বে যখন ৮ ঘন্টার শ্রম ঘন্টা কমিয়ে ৫/৬ ঘন্টা করা হয়েছে সেখানে আমাদের দেশে এখনও শ্রমিকদের ১০/১২ ঘন্টা কাজ করতে বাধ্য করা হয়। দেশে সরকারি কর্মচারীরা ২ দিনের ছুটি ভোগ করে। সেখানে শ্রমিকদের এটা ধরাছোঁয়ার বাইরে।

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের শ্রমিকদের সঙ্গে এখনো দাস সুলভ আচরণ করা হয়। বিশেষ করে গার্মেন্ট মালিকরা ভাবে শ্রমিকরা হয় পশু নয়তো যন্ত্র।

এদের আবার বিশ্রাম কিসের? আর বিনোদন? পশুর আবার বিনোদন? নির্লজ্জের মত গার্মেন্ট মালিকরা শ্রমিকদের এমন কী মহিলা শ্রমিকদের ১০/১২ ঘন্টা করে খাটাচ্ছে। তাও সরকারের নাকের ডগায়। একই অবস্থা হোটেল , ট্রান্সপোর্টসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এমন কী সংবাদপত্রেও মালিকরা সাংবাদিক কর্মচারীদের সঙ্গে দাস সুলভ আচরণ করে। শুধু তাই নয় মারধরও করে। অপ্রাতিষ্ঠানিক সংস্থার পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ।

ক্ষেতমজুরদের অবস্থাও নাজুক। তাদের সারা বছরের কাজের নিশ্চয়তা নেই,নেই ন্যায্য মজুরী। উপরন্তু ক্ষেতমজুরদের ওপর চলে নির্মম শোষণ নির্যাতন। ফলে ক্ষেতমজুরদের বৃহৎ অংশের দু-বেলা দু-মুঠো ভাত জোটে না। ছেলে মেয়েদের শিক্ষা-চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে না। ফলে দিনকে দিন ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য বাড়ছে। এই অবস্থায় মে দিবসের লড়াই সংগ্রামের তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর তাইতো মে দিবসের উৎসবে বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণি আনন্দ উৎসবের মধ্যেও তাদের সংগ্রামী চেতনাকে শাণিত করতে সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করে।

যে শপথে বলিয়ান হয়ে এদেশের শ্রমিক শ্রেণি তাদের অধিকার আদায়ের পাশাপাশি সমাজবদলের সংগ্রামকে এগিয়ে নেবে। যে সমাজে শোষণ নির্যাতন থাকবে না, যে সমাজে মালিকের রক্তচক্ষু দেখতে হবে না। বরং শ্রমিকরা তাদের নিজ গরজেই উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিবে। এ জন্য দরকার শ্রমিক শ্রেণির ঐক্য । সেই ঐক্যের শিক্ষাই হচ্ছে আজকের মে দিবসের শিক্ষা।

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় কেন পহেলা মে শ্রমিক দিবস নয়

দ্য রিপোর্ট ডেস্ক

যে মে দিবসের সূচনা যুক্তরাষ্ট্র থেকে সেই যুক্তরাষ্ট্রেই ১ মে শ্রমিক দিবস হিসেবে পালিত হয় না। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা এই দুইটি দেশ পহেলা মে-র পরিবর্তে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবার শ্রম দিবস হিসেবে পালন করে।

১৮৮৬ সালের মে মাসে প্রথম সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের হত্যাকাণ্ডের পর দেশটির তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড মনে করেছিলেন পয়লা মে তারিখে যেকোন আয়োজন হানাহানিতে পর্যবসিত হতে পারে। সে জন্য ১৮৮৭ সালেই তিনি পহেলা মে-র পরিবর্তে সেপ্টেম্বরে শ্রম দিবস পালনের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। একইভাবে ১৮৯৪ সালে প্রধানমন্ত্রী জন স্পারও ডেভিড থমসন সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবার কানাডার সরকারি শ্রমিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন।

বর্তমানে চীন, উত্তর কোরিয়া, কিউবা ও কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন বিভিন্ন দেশে ১ মে 'শ্রম দিবস' হিসেবে গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হয়। ভারত, বাংলাদেশসহ এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের ৮০টিরও বেশি দেশে মে দিবস সাধারণ ছুটি ও শ্রমিক দিবস হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। পাকিস্তান আমলে মে দিবস পালন সরকারিভাবে নিষিদ্ধ থাকলেও বামপন্থি ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়নসহ শ্রমিক সংগঠনগুলো দিনটি পালন করত। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে সাধারণ সরকারি ছুটি পালন করা হয়।

১৮৮৬ সালের ১ মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো নগরীর শ্রমিকরা দৈনিক আট ঘণ্টা কর্মসময় নির্ধারণ ও ন্যায্য মজুরির দাবিতে সর্বাত্মক ধর্মঘট শুরু করে। এতে যে আন্দোলনের সূচনা হয়, তা চূড়ান্তরূপ লাভ করে ৩ ও ৪ মে। এই দুইদিনে শিকাগোতে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায় ১০ জন শ্রমিক, আহত হয় অনেকে। পুলিশ অনেক শ্রমিককে গ্রেপ্তার করেন। এই শ্রমিকদের মধ্যে চারজনকে পরে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। কারাগারে বন্দীদশায় আত্মহনন করেন একজন শ্রমিক নেতা। শ্রমিক আন্দোলনের এই গৌরবময় অধ্যায়কে স্মরণীয় করে রাখতে ১৮৯০ সাল থেকে পালিত হয়ে আসছে মে দিবস।

সময়ের ঘোড়দৌড় ও একজন সাদা শ্রমিক

মীর ইয়ামীন যায়ীম

সারাদিন অফিস করে আড়াই ঘন্টা জ্যাম ঠেলে যখন বাসায় পৌঁছুলাম তখন রাত প্রায় পৌনে নয়টা। ঠিক তখনই অফিসের মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো । একটা নোটিফিকেশন দেখতে পেলাম, মিটিং এর ই-মেইল এসেছে | সেদিনই রাত সাড়ে নয়টায়, অর্থাৎ ৪৫ মিনিট পরেই মিটিং, তাও আবার আধা ঘন্টার মিটিং না, এক ঘন্টার মিটিং। সামনে একটি প্রজেক্ট ডেলিভারি আছে তাই মিটিং কল করা হয়। তাই গ্রুপের বেশিরভাগ মানুষের কাছেই তাই এই ইমেইলটি যায় । মিটিং এর মধ্যে আমার কাছে ইনস্ট্রাকশন আসলো যে আমাদের যে বিদেশি প্রজেক্ট কনসালটেন্ট আছে, তার সাথে কো-অর্ডিনেট করতে হবে। মিটিং শেষ সবাই মিটিং থেকে বের হয়ে গেল। আমি ভাত খেতে বসলাম ।

রাত চারটায় হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠলো, তাও আবার অফিসের ফোন । একটা অপরিচিত বিদেশী নাম্বার। ফোনটা ধরেই বুঝতে পারলাম আমার কনসালটেন্ট ফোন করেছে। তার ইংলিশ কথাগুলো আমার কাছে হিব্রু ভাষার মতো শুনতে লাগছিল। কথা শেষ করে ফোনটা রেখে দিলাম। আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ কানের পাশে অনেক জোরে বেল বেজে উঠলো। এক চোখ খুলে দেখি সকাল ৬ টা বাজে। অফিস যাওয়ার সময় হয়েছে। সোয়া সাতটার মধ্যে যদি বের না হতে পারি তাহলে কখনোই সকাল নয়টার মধ্যে অফিসে ঢুকতে পারবো না । তাই মেজাজ খারাপ করে উঠে পড়লাম। প্রতিদিন ঢাকায় ট্রাফিক জ্যাম বেড়ে যাচ্ছে। সেদিন অফিসে ঢুকতে ঢুকতে প্রায় নয়টা বিশ বেজে গেল। তাড়াতাড়ি করে ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করে দিলাম।

কাজ করতে করতে হঠাৎ আবার ইমেইল পেলাম। মিটিং কল করেছে। কিভাবে যে সময় চলে যেতে থাকলো বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ করে ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল। দুপুর ২ টা বাজে। ক্যাফেটেরিয়াতে এডমিন অফিসারের সাথে দেখা হল। এডমিন কথার কৌশলে আমাকে মনে করিয়ে দিল যে আমি অফিসে লেট করেছি। তার কথা শুনে মনটা কেন যেন ছোট হয়ে গেল। কোনমতে খাওয়া শেষ করে আবার কাজে বসে পড়লাম।

খুকুর খুক করে মাইকে একজন মানুষ কেশে উঠল। মুয়াজ্জিন মাইক ঠিক করছে আসরের আজান দেওয়ার জন্য। পাশ থেকে আমার কলিগ চেয়ার ছেড়ে উঠে চা খেতে গেলো, সিগারেটের প্যাকেট নিতে ভুলল না। আর আমি সেই গাধার মত কাজই করতে থাকলাম কারণ সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে ক্লাইন্টকে একটা ফাস্ট ড্রাফট পেপার ইমেইল করতে হবে ।

হঠাৎ বস ফোন করল। কেন ইমেইলটা পাঠাচ্ছি না,জিজ্ঞেস করল। এর সাথে নতুন ইনস্ট্রাকশন দিল প্রজেক্ট কনসালট্যান্টকে সিসি এবং বসকে বিসিসি করতে । ঘড়িতে তখন ছয়টা দশ ।মনে হচ্ছিল ঘড়ির সময় যেন ঘোড়দৌড়ের ট্র্যাকে চলছে । তাড়াতাড়ি করে ইমেইল করে দিলাম আর ব্যাগ গোছানো শুরু করলাম। লিফটের সামনে যেতে মাগরিবের আজানের শব্দ পেলাম ।

দীর্ঘ সময় নিচে দাঁড়িয়ে থাকার পরে একটি সিএনজি পেলাম যেটা আমার বাসার দিকে যেতে রাজি হল। তাও

আবার রেগুলার ভাড়ার থেকে প্রায় ১০০ টাকা বেশি। সারাদিন পর নিজের ফোনের দিকে তাকালাম। বাসা থেকে ফোন কলটা এসেছিল, ধরতে পারিনি । ফোনে টেক্সট মেসেজ ওপেন করে দেখি মা মেসেজ করেছেন। টেক্সট মেসেজে লেখা "বাবা আজকে টাকা নিয়ে আসিস বাসা ভাড়া দিতে হবে" । ব্যাংকে কোন টাকা নেই, কারণ এখনও ফুল বেতনটা পাই নাই ফিফটি পার্সেন্ট বেতন দিয়েছিল, তাও ১০ দিন আগে। মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল ।

আমি ভাবতে থাকি যে কোভিডের পর সবকিছু বদলে দিয়েছে। অফিসে চাকরির ধরন চেঞ্জ হয়ে গেছে । নরমাল মোড টু হাইব্রিড মোড। কিন্তু এই হাইব্রিড মোড আশাতে এখন প্রায় নয় ঘন্টা থেকে ১২ ঘন্টা কাজ করতে হয়। যা নিয়মিত ঘন্টার চেয়ে বেশি।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এক্সট্রা আওয়ার্স এর জন্য অফিস কিন্তু আমাকে এক্সট্রা টাকা দেয় না । এই চাকরিটা নেওয়ার সময় প্রতি সপ্তাহে চল্লিশ ঘন্টা কাজ করার পলিসি ছিল, তাও আবার বোল্ড লেটারে লেখা। কিন্তু আসলেই কি আমরা ৪০ ঘন্টা কাজ করি নাকি বেশি করি? আমাদের অবস্থা ডেইলি লেবারের চেয়েও খারাপ। এসব চিন্তা করতে করতে চোখ লেগে গেল, ঘুমিয়ে পড়লাম। "মামা উঠেন বাসায় চইলা আইছি" সিএনজি ওয়ালা ডাক দিল। ঘড়িতে আটটা চল্লিশ বাজে । ঘরের দরজার সামনে যেতে অফিসের ফোনটা আবার বেজে উঠলো। তার মানে নতুন কাজ এসেছে। আবার কাজে লাফ দিয়ে পড়তে হবে।

ইসলামে ন্যায্য মজুরি শ্রমিকের অধিকার

দ্য রিপোর্ট ডেস্ক

ইসলাম একটি উচ্চ মানসিকতাসম্পন্ন শ্রমনীতির কথা বলেছে, যেখানে শ্রমিকের মানসম্মত জীবন-জীবিকা নিশ্চিত হয়। হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদের তোমাদের অধীন করেছেন। সুতরাং যার ভাইকে তার অধীন করেছেন সে যেন তাকে তাই খাওয়ায় যা সে খায়, সে কাপড় পরিধান করায়, যা সে পরিধান করে। তাকে সামর্থ্যরে অধিক কোনো কাজের দায়িত্ব দেবে না। যদি এমনটা করতেই হয়, তাহলে সে যেন তাকে সাহায্য করে।' -সহিহ বোখারি : ৫৬১৭

শ্রমিকের মর্যাদাপূর্ণ জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব মালিকেরই। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মালিকানাধীন (অধীন) ব্যক্তির জন্য খাবার ও কাপড়ের অধিকার রয়েছে। (মুসলিম, হাদিস : ১৬৬২)

অন্য হাদিসে তিনি বলেছেন, যে আমাদের কর্মী নিযুক্ত হয়েছে সে যেন (প্রতিষ্ঠানের খরচে) একজন স্ত্রী সংগ্রহ করে, সেবক না থাকলে সে যেন একজন সেবক খাদেম সংগ্রহ করে এবং বাসস্থান না থাকলে সে যেন একটি বাসস্থান সংগ্রহ করে। যে ব্যক্তি এর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করবে সে প্রতারক বা চোর গণ্য হবে। (আবু দাউদ, হাদিস : ২৯৪৫)

বেতন ও পারিশ্রমিক কর্মজীবীর অধিকার। ইসলাম দ্রুততম সময়ে তা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ঘাম শুকানোর আগেই শ্রমিকের পারিশ্রমিক দিয়ে দাও। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৪৪৩০) আরেক হাদিসে পারিশ্রমিক ও প্রাপ্য অধিকার নিয়ে টালবাহানাকে অবিচার আখ্যায়িত করা হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেন, ধনী ব্যক্তির টালবাহানা অবিচার। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২২৮৭)

অর্থাৎ সামর্থ্য থাকার পরও মানুষের প্রাপ্য ও অধিকার প্রদানে টালবাহানা করা অন্যায়। আর ঠুনকো অজুহাতে বেতন-ভাতা ও প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ভয়ংকর অপরাধ। নবী কারিম (সা.) বলেন, 'কেয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিপক্ষে থাকব। ... আর একজন সে যে কাউকে শ্রমিক নিয়োগ দেওয়ার পর তা থেকে কাজ বুঝে নিয়েছে অথচ তার প্রাপ্য দেয়নি।' -সহিহ বোখারি : ২২২৭

শ্রমিক ঠকানো ইসলামের দৃষ্টি জঘন্যতম পাপ, বরং ইসলামের নির্দেশনা হলো- শ্রমিক তার প্রাপ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হলেও মালিক তাকে প্রাপ্য বুঝিয়ে দেবে । নবী কারিম (সা.) এই ব্যাপারে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, 'যে জাতির দুর্বল লোকেরা জোর-জবরদস্তি ছাড়া তাদের পাওনা আদায় করতে পারে না সেই জাতি কখনো পবিত্র হতে পারে না।' -ইবনে মাজাহ : ২৪২৬

দৈনন্দিন জীবনে শ্রমিক সমাজের ন্যায্য মজুরি প্রদানে সবার সতর্ক থাকা উচিত। যেন হাক্কুল ইবাদ লঙ্ঘনের দায়ে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহর দরবারে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে না হয়। এ কারণে পৃথিবীর বুকে শ্রমিকের যথাযোগ্য মর্যাদা ও মজুরি নির্ধারণে সবাইকে সচেষ্ট থাকতে হবে। কেননা ন্যায্য মজুরি শ্রমিকের অধিকার। আল্লাহ সবাইকে শ্রমিকের অধিকার আদায়ের তৌফিক দান করুক, আমিন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এনএসইউ'ই সুনাম ধরে রেখেছে

শামীম রিজভী

বরাবরের মত শুধুমাত্র বাংলাদেশের নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (এনএসইউ) সুনামের সাথে নিজেদের অবস্থান জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ধরে রেখেছে। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আতিকুল ইসলামের নেতৃত্বে এনএসইউ যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা সাময়িকী টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) প্রকাশিত সর্বশেষ ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং-২০২৩-এ ৬০১-৮০০ এর মধ্যে উঠে আসে। টিএইচই ইয়ং ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিংয়ে ২০২৩ সালে বাংলাদেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় এনএসইউ। এই র‍্যাঙ্কিংয়ে অনূর্ধ্ব ৫০ বছর বয়সী বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গণ্য করা হয়। ২০২২ সালের ৩ জুলাই এই র‍্যাঙ্কিং প্রকাশিত হয়। এটি বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত কারণ দেশের ৫০ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মোট ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় টাইমস হায়ার এডুকেশন র‍্যাংকিংয়ে অবস্থান করে নিয়েছে, যেখানে এনএসইউ একমাত্র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এ ছাড়া কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিংয়েও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এনএসইউ বাংলাদেশের শীর্ষে রয়েছে। বিষয় ভিত্তিক কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং ২০২০ এ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি বিজনেস এন্ড ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে (ব্যবসা এবং অর্থনীতি অনুষদ) ৪০১-৪৫০ এবং কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিষয়ে ৫৫১-৬০০তম (ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ফিজিক্যাল সাইন্স অনুষদ) স্থান দখল করে। সমস্ত র‍্যাঙ্কিং মানদণ্ড এবং প্ল্যাটফর্মে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি অব্যাহতভাবে তার শীর্ষস্থান দখল করে রাখে। কিউএস এশিয়া র‍্যাঙ্কিং ২০২০ এ বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ৩০০তম স্থান অর্জন করে এবং ওয়েবম্যাট্রিক্স দ্বারা ঘোষণা করা র‍্যাঙ্কিং এ প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্থান লাভ করে। এর আগে, কর্মক্ষম জনশক্তি তৈরীর র‍্যাঙ্কিং ২০১৯ এ এনএসইউ স্নাতকের জন্য বৈশ্বিক শীর্ষ ৫০০ এর তালিকায় উঠে আসে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পারফরম্যান্সের সাথে তুলনা করে স্নাতক নিয়োগের ফলাফল এবং সম্ভাবনার শর্তাদি। এটি একটি অভূতপূর্ব অর্জনের মানদণ্ড, যা প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে।

তাছাড়াও, ওআরজি-কোয়েস্ট রিসার্চ লিমিটেডের একটি রিসার্চে ২০১৯ সালে করা র‍্যাংকিংয়েও শীর্ষস্থানে থাকে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি। উল্লেখ্য, এ সকল অর্জনই হয়েছে বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আতিকুল ইসলামের নেতৃত্বে। এ কারণে অধ্যাপক আতিকুল ইসলামকে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য পদে তৃতীয় মেয়াদে পুনঃনিয়োগ দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম ২০১৬ সালে প্রথম নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হন। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য পুনরায় নিয়োগ পান। ২০২৪ সালের মার্চে তৃতীয় মেয়াদে নিয়োগ পান তিনি। অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম ২০২৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য পদে দায়িত্ব পালন করবেন।